‘খিলাফাহ ঘোষণা’ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তআলোচনা

শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-মুহাজির (হাফিজাহুল্লাহ)

১৪৩৫ হিজরি/ ২০১৪ ঈসায়ী

ভূমিকা

মিম্বর আত্তাওহীদ ওয়াল জিহাদ

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ

অতঃপর...

এটি হচ্ছে ‘খিলাফাহ ঘোষণা’ সম্পর্কে আরব উপদ্বীপের আমাদের ভাইদের পক্ষ থেকে একটি ইলমি আলোচনা, যেটাকে মেনেনিতে এর ঘোষক সারাবিশ্বের সকল মুসলমানদের উপর ওয়াজিব (আবশ্যক) করেছেন এবং এর বাইয়াতে দেওয়াকে আবশ্যক করেছেন। বরং অন্যান্য জিহাদিগ্রুপ ও দাওয়াতিগ্রুপ সমূহকে বাতিল করে এইসবের অনুসারীদেরকে আহবান করেছেন যে তারা যেনো নিজেদের দলসমুহ ত্যাগ করে তাদের কাছে বাইয়াহ দেয়, এবং যারা তাদের দিকে হিজরত করবে না এবং তাদের খলীফার কাছে বাইয়াহ দিবে না, তাদেরকে গোনাহগার হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন...

এসব এবং অন্যান্য সকল প্রভাব ও দাবী, যা তারা বিন্যস্ত করছে ও উম্মাহর উপর চাপিয়ে দিচ্ছে ওই ঘোষণার উপর ভিত্তি করে যা তারা ঘোষণা করেছে এমন মাসআলা সীমালঙ্ঘন করে যে,প্রকৃতপক্ষ্যে খলিফা নির্ধারনের পন্থার ক্ষেত্রে তাদের এ ঘোষণা কিশরয়ীতের আলোকে বিশুদ্ধ হয়েছে ,যেসকল পন্থা উম্মাহর উলামায়ে কেরাম কর্তৃক স্বীকৃত?!তারা মূল বিষয় নির্ধারণের পূর্বে এই আনুষাঙ্গিক মাসয়ালায় চলে গেলো, সিংহাসন স্থাপনের পূর্বে শয়নস্থল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।মুসলমানদের উপর ফলাফলকে ওয়াজিব করে দিল নিজেদের উপর আবশ্যক করা ব্যতীত অথবা মুসলমানদের অধিকারসমূহকে ওইসমস্থ ভূ-খন্ডে আদায় করার পূর্বে যেগুলোর উপর খিলাফাহ ঘোষণা করে নিজেদের আধিপত্য ব্যাপক করেছে...

এটা এমন এক বিষয়,একেনা শরীয়াহস্বীকৃতি দেয় আর না বিবেক মেনে নেয়। যেমনিভাবে আমাদের ভাই শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-মুহাজির (হাফিজাহুল্লাহ) তার এই উপকারী সংক্ষিপ্ত ইলমি পুস্তিকায় বর্ণনা করেছেন।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেনো তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করেন, তিনি যা লিখেছেন এর দ্বারা মুসলমানদেরকে উপকৃত করেন, মুসলমানদেরকে খিলাফাহ এবং তামকীন(ভূমিতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ) দান করেন। মুজাহিদদের মধ্যে একতা দান করেন, যাতে তারা নিজেদের রক্তের সংরক্ষণ করেন... সাল্লাল্লাহু আলা ওয়া সাল্লাম আলা নাবিয়্যিনা ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন।

মিম্বর আত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ

জিলকা'দা মাসের প্রারম্ভ ১৪৩৫ হিজরি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন...

অতঃপর :

একথা সবার জানা যে, খিলাফাহ ঘোষণা সংক্রান্ত (দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক ও শাম) ভাইদের পক্ষ থেকে যা অতিবাহিত হয়েছে, এবং এরপর যা অন্ধ অনুসরণ, অপলাপ এবং একগুয়েমি ব্যতীত আলোচ্য শরয়ী কথা গ্রহণ না করা, এমন একগুয়েমি যা সত্য থেকে অন্ধ করে দেয়, বিন্যাসকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এটা হচ্ছে এক শরয়ী বিষয়, মনে প্রতিক্রিয়া, রিপু এবং ব্যক্তিগত মতামতের স্থান নয়। সুতরাং ওইসব ব্যক্তির জন্যে আবশ্যক হচ্ছে যাদের মধ্যে এই ইলম নেই যার দ্বারা সে সত্য চিনতে পারবে তার জন্যে উচিৎ হলো এমন বিষয়ে একগুয়েমি থেকে বিরত থাকা যে সম্পর্কে সে জাহিল, এমন অনেক আছে তাদেরকে যদি খিলাফতের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যেমন- শরয়ী পদ্ধতিতে তার প্রতিষ্ঠা, জনগণের উপর ইমামের অধিকার, ইমামের উপর প্রজাদের অধিকার অথবা এমনধরনের কিছু প্রশ্ন তাহলে দেখবেন এরা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারপরও তাকে পাবেন সে এমন সব মাসআলায় কথা বলছে এবং সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যার চেয়ে শতগুণ ছোট বিষয়ের উপর হযরত উমর রায়িয়াল্লাহু সিদ্ধান্ত নিতে আনসার-মুহাজির এবং মক্কা বিজয়ের সাহাবীদেরকে একত্রিত করেছেন। প্রত্যেক মুসলমানের জেনে রাখা উচিৎ যে, তাকে ওইসব বাক্য সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে যেগুলোর মধ্যে সে আল্লাহকে ভয় করে নি, এমন ওইসব হুকুম সম্পর্কে যার মধ্যে সে সত্যের আশ্রয় নেয় নি। জেনে রাখা উচিৎ যে, আবেগ এবং অতিউতসাহ দলীল নয় যে এগুলোকে সমর্থন করা যাবে অথবা এই ঘোষণাকে মানতে হবে। এজন্য তার জন্যে আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা, এবং দলীল দ্বারা সত্যকে চিনা, তার আবেগ, অতিউতসাহ, বাহ্যিক চাকচিক্য এবং পুর্বের হুকুম যেনো তাকে প্রভাবিত না করে অথবা এই মাসআলাকে সে যেনো এর দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দেয় এবং উম্মতের ঐসকলআলেমদের অনুসরণ করে যাঁদের দ্বীনদারিতা, সততা এবং ইলমের উপর সে আস্থা রাখে। যাদের মতকে অন্যকিছু অর্জনের পুর্বে নির্ভরযোগ্য মনে করে। আমাদের কারো উচিৎ নয় নিজে নিজেকে ধোকা দেওয়া। সে এমন ব্যক্তিকে খুজে বেড়ায় যার সাথে তার মতের মিল হয় তারপর সে বলে আমি অমুকের

মতকে নির্ভরযোগ্য মনে করি অথচ সে তাকে পর্যবেক্ষণ করে নি এবং তাকে প্রথমে গ্রহণ করে নি। সে যেনো জেনে রাখে যে সে অবশ্যই কিয়ামতের দিন প্রশ্নবিদ্ধ হবে সে কেনো সত্যের অনুসরণ করে নি, তাকে কক্ষনো এ প্রশ্ন করা হবে না যে, সে কেনো নিজের আবেগ যা তুমি পছন্দ করো এবং অতিউৎসাহের অনুসরণ করে নি। বরং তুমি অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ হবে যদি সত্যের অনুসরণ না করোঃ কেনো তুমি মনের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করলে এবং সত্যকে ত্যাগ করলে? প্রত্যেক মুসলমান যেনো অবশ্যই মুজাহিদদের জন্যে বিশেষভাবে এবং মুসলমানদের জন্যে সাধারণভাবে হেদায়ত ও তাওফীকের জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন এবং নিচের দোয়াটি বেশী বেশী পাঠ করেনঃ

« اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »

(হে আল্লাহ! জিব্রাঈল, মীকাঈল এবং ইস্রাফীলের রব, নভঃমন্ডল এবং ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা, গায়েব এবং শাহেদ-এরজ্ঞানী, তুমি বিচার করো তোমাদের বান্দাদের মাঝেসে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করে। আমাকে হেদায়ত দাও এমন বিষয়ে যে হকের ব্যাপারে ওরা মতানৈক্য করে। নিশ্চয় তুমি যাকে চাও তাকে সরল পথ প্রদর্শন করো।)

আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় চেষ্টা করবো এই ঘোষণাকে নিরপেক্ষভাবে দলীল সহকারে বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপন করতে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহর কাছে তাওফীক এবং শুদ্ধতা চাই।

আমরা বলিঃ প্রথমতঃ; এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে 'ইমামত' শরয়ী দুই বৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তৃতীয় কোন বৈধ পন্থা নেই। এ দুটি হচ্ছে, **"ইখতিয়ার"("আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ"** কর্তৃক জনগণের পছন্দে নির্বাচন), "**ইস্তেফলাফ**"(পুর্বের খলীফা কর্তৃক স্থলাভিষিক্ত হওয়া)। আর তৃতীয়টির শরয়ী বৈধতা নেই, এবং সেটি হচ্ছে জোর-পুর্বক আধিপত্য।

আমাদের জানা উচিতযে,এই ঘোষনার দ্বারা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা বিশুদ্ধ হয়ে গেছে নাকি হয়নি ?আমাদের উচিত এ বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং আলোচনা করা যেঃএসব পদ্ধতির কোন পদ্ধতিতে এই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?!

আমরা এই প্রশ্নের উত্তরের উপর আলোকপাত করা ও আলোচনা করার পূর্বে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কথার উদ্ধৃতি দিবো, এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে এটার প্রতিষ্ঠার জন্যে আহলে হাল ওয়াল আকদের গুরুত্ব বোঝা। তারপর আমরা অধিকতর প্রণিধানযোগ্য কথা উল্লেখ করবো, আর এটা হচ্ছে এব্যাপারে অধিকাংশ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কথা। অতঃপর এই ঘোষণাকে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দেখবো ইনশা আল্লাহ, আমরা আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বলছিঃ

এ ব্যাপারে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছেনঃ

প্রথমঃ একদল যারা খলীফা নির্বাচনের জন্যে সবার ঐক্যমত শর্ত দিয়েছেন, এক্ষেত্রে তারা নির্দ্রিষ্ট কোনো সংখ্যা উল্লেখ করেন নি...

তারপর এরা আবার দুভাগে বিভক্ত হয়েছেনঃ

১- আহলে হাল ওয়াল আকদ যাকে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করবেন তার ব্যাপারে সবার ঐক্যমত হওয়া।

আশআরী বলেছেন, যে এটা হচ্ছে মুতাযিলাদের মধ্য থেকে আসম্মের মত।

২- একদল আহলে হাল ওয়াল আকদের ঐক্যমত শর্ত করেছেন, এদিকেই আবু ইয়া'লা তাঁর গ্রন্থে (আল-মুতামাদ ফী উসুলিদ্দীনে) ধাবিত হয়েছেন।

আমরা যদি এই মতে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই যে এটা দুই ভাবে পরিত্যাজ্যঃ

প্রথমঃ এমন সব নির্বোধ ব্যক্তিদের ঐক্যমত যাদের দিকে মোটেও দৃষ্টিপাত করা হয় না। এটা এজন্য যে এরা শরয়ী এবং বুদ্ধিভিত্তিক উভয় দিক দিয়ে প্রত্যাখাত। শরয়ী এজন্য যে এব্যাপারে কোনো দলীল বর্ণিত হয় নি, সাহাবাদের বাস্তবতার আলোকে দেখা দেয় যে, এ বিষয়কে ধর্তব্য করা হয় নি, এটা এমন যা ইবনে হাযম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেছেন, (সামর্থ্যের বাহিরে কোনো বিষয় চাপিয়ে নেওয়া, যার সাধ্য নেই এটা হচ্ছে অন্যতম হারজ,(অসুবিধা)। আল্লাহ তা'আলা সামর্থ্যের বাহিরে চাপিয়ে দেন নি। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ দ্বীনের মধ্যে তোমাদের জন্যে হারাজ(অসুবিধা) সৃষ্টি করেন নি। আর বুদ্ধিভিত্তিক ভাবে এজন্য যে, নির্বোধের স্তরেরা কোনো না কোনো দলের অনুসারী হয়, যার মধ্যে অশ্লীলতা এবং উশৃংখলার প্রভাব থাকে, সুতরাং সে বুঝে-শুনে স্থিরভাবে ন্যায়-পরায়ন ইমামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

নিতে পারবে না। এর দ্বারা একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে অসুবিধা সৃষ্টি হবে, কেননা যদি তারা সঠিক নির্বাচনে ভূল করে তাহলে তারা অবশ্যই গোনাহ বহন করবে, তারা এর জুলুম ও গোনাহের অংশীদার হবে।

আর দ্বিতীয় অংশ এজন্য পরিত্যাজ্য যে, সাহাবা যুগে এর এরকম পাওয়া যায় নি, যেমন আবু বকর রাজিয়াল্লাহুকে খলীফা নির্বাচনের সময় সব আহলে হাল ওয়াল আকদ একমত হন নি। যেমন সা'দ বিন উবাদাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু, অথচ এরপরও বাইয়াহ সম্পন্ন হয়েছিলো। এটাই হচ্ছে সবার ঐক্যমত শর্ত না হওয়ার দলীল, এমনিভাবে এর মধ্যে অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগ রয়েছে।

দ্বিতীয় মতঃ

এরা হচ্ছেন তারা যারা আহলে হাল ওয়াল আকদের জন্যে নির্ধারিত সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহের বর্ণানুযায়ী এদের অধিকাংশ হচ্ছেন তর্কশাস্ত্রবিদরা।

এর নির্দ্রিষ্ট সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়ঃ

একদল বলেন, **খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে চল্লিশ এর কম হবে না,** কেননা খলীফা নির্ধারণ করা জুম'আর নামাজের চেয়ে বাড়িয়ে আর জুম'আর নামাজ চল্লিশের কম সংখ্যায় হয় না)

আর অনেকে বলেন, যে **খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বনিম্ন সংখ্যা পাঁচ,** অথবা একজন বাকী চার জনের সন্তুষ্টি নিয়ে প্রতিষ্ঠা করবে। এ হিসেবে তারা যুক্তি উপস্থাপন করে যে আবু বকর বাগদাদীর খিলাফাহ পাচ জন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেননা হযরত উমর রাজিআল্লাহু পাচ জনের মজলিশে শূরা গঠন করেছেন।

এই কথাকে জুব্বায়ী মুতাজিলার শায়খগণ এবং কাযী আব্দুল জব্বারের দিকে বিশেষিত করা হয়।

কেউ কেউ বলেন, **এর প্রতিষ্ঠার জন্যে চার জন শর্ত,** তারা সাক্ষ্য প্রদানের নেসাবের উপর কিয়াস করেন।

আর কেউ কেউ বলেন, **এর প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনজন হওয়া শর্ত,** কেননা এটা হচ্ছে এমন দল যার বিরোধিতা করা জায়েয নয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, এর প্রতিষ্ঠার জন্যে **তিনজনের মধ্যে দুজনের সন্তুষ্টি যথেষ্ট,** কেননা দুই হচ্ছে বহু বচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা, তারা দুজন হবেন সালিস ও সাক্ষ্যদাতা যেমনিভাবে একজন ওলী এবং দুজন স্বাক্ষী দ্বারা বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যায়। মাওয়ার্দি এই মতকে উলামায়ে কুফার দিকে বিশেষিত করেছেন। আর বাগদাদী এই কথাকে সুলায়মান বিন জারীর যায়দী এবং মুতাজিলার একগ্রুপের দিকে বিশেষিত করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, **একজন দ্বারাই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়,** তারা এই কথাকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন যে, হযরত আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমার হাত বাড়াও আমি বাইয়াহ দিব, তখন লোক বলবে, যে রাসুলুল্লাহের চাচা তাঁর ভাতিজার হাতে বাইয়াহ দিয়েছেন, তখন তোমার উপর তৃতীয় কোনো ব্যক্তি দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না।

কেননা যখন উমর রাজিয়াল্লাহু হযরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহুর হাতে বাইয়াহ দিয়েছেন তখন তাঁকে অনুসরণ করে অনেকে তাঁকে বাইয়াহ দিয়েছেন, এবং এব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছেন। কেননা এটা হচ্ছে হুকুম, এবং একজনের হুকুম(নির্দেশ) বাস্তবায়িত হয়। এখান থেকে আশয়ারীরা এভাবে বলেন, এবং এটাই যায়দিয়্যাহের মত।

অধিকাংশ শাফেয়ীদের মত হচ্ছে, যে, তাদের দ্বারা খিলাফাহ **প্রতিষ্ঠা বৈধ হবে বাইয়াতের সময় ওই স্থানে** যাদের উপস্থিত হওয়া সম্ভব। এরা হবেন আলেমগণ, নেতৃবৃন্দ এবং সাক্ষ্য প্রদানের গুণে গুণান্বিতরা। এমনকি যদি এটা একজন হাল ওয়াল আকদের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে এটা যথেষ্ট।

এইসব কথা ও মতের উপর গভীর পর্যবেক্ষণের ফলে আমরা নিম্নোক্ত মতসমূহকে প্রত্যাখাত পাইঃ

১- আহলে হাল ওয়াল আকদের সংখ্যার কিয়াস জুম'আর সংখ্যা বা সাক্ষ্যপ্রদানের সংখ্যা অথবা অন্য কিছুর উপর করা সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা এটা হচ্ছে বিপরীতার্থের কিয়াস। যে বিষয়ে উম্মাহের সবার স্বার্থ নিহিত এমন বিষয়ে সামান্য সংখ্যাকে চূড়ান্ত হিসেবে নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। আল্লাহ না করুন, তবে যে সময় আহলে হাল ওয়াল আকদের সংখ্যা কম হবে - যদিও এ বিষয় অসম্ভব নয় তবে সুদুর পরাহত- তখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্যে কম সংখ্যাই হবে একমাত্র উপায়। (কেননা এটা তাদের কথা নয় যারা বলেন, দুজনের দ্বারাই প্রতিষ্ঠা হবে যাবে, তাদের কথাও নয় যারা বলেন, চারজন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, এটা তাদের কথার মতোও নয় যারা বলেন, এক দল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।)

২- এখন এই যুক্তি উপস্থাপন করা যে আবু বকর ও উমর রাজিয়াল্লাহুমার বাইয়াহ সঠিক হয় নি, কেননা আবু বকর রাজিয়াল্লাহুর বাইয়াহ শুধু পাচ জন দ্বারা হয় নি যাদের কথা তারা উল্লেখ করে, এটা বরং আনসার ও মুহাজিরদের শীর্ষ সাহাবীদের বাইয়াহ দেওয়া সম্পন্ন হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ, এক রাফেজীর জবাবে বলেন, যে তারা বলে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ইমাম হচ্ছেন আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু উমর এবং আরো চার

সাহাবী রাজিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াতের কারণে, তিনি বলেন, তাকে বলা হলো, (এটা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহের ইমামদের মত নয়, যদিও কিছু তর্কশাস্ত্রবিদরা বলেন, ইমামাত চার জনের বাইয়াহ দ্বারা হয়ে যায়, যেমনিভাবে কেউ কেউ বলেন, দুজনের বাইয়াহ দ্বারা হয়ে যায়, কেউ কেউ বলেন, একজনের বাইয়াহ দ্বারা। এগুলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহের ইমামদের কথা নয়, বরং তাদের কথা ইমামত বাস্তবায়িত হবে প্রভাবশালীদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে, কোনো ব্যক্তি ইমাম হতে পারবে না যতক্ষণ না এমন আহলে শাওকাহ (প্রভাবশালীরা) আনুগত্য করবেন যাদের দ্বারা ইমামতের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।) তিনি আরো বলেন, (যদি মেনে নেই যে হযরত উমর ও তার সাথে একদল বাইয়াহ তাকে দিয়ে দিছেন -আবু বকরকে- এবং অন্যান্য সাহাবার তার বাইয়াহ থেকে বিরত থেকেছেন তাহলে তিনি এর দ্বারা ইমাম হন নি, তিনি বরং অধিকাংশ সাহাবীদের বাইয়াহ দ্বারা ইমাম হয়েছেন এবং তারা হচ্ছেন আহলে কুদরাহ ও শাহকাহ (প্রভাবশালী ও মান্যবর)...

৩- এমনিভাবে উমর রাজিয়াল্লাহু খিলাফাহকে তার নির্বাচিত ছয় জন ব্যক্তির উপর সীমাবদ্ধ করেছেন। আমরা বলবো, প্রথমতঃ এটা হচ্ছেঃ কেননা উমর রাজিয়াল্লাহু যাদেরকে চয়ন করেছেন তার কারণ সাহাবারা যারা মূলত আহলে হাল ওয়াল আকদ তারা তার কাছে এই চেয়েছেন যে তিনি যেনো তাদের জন্যে কাউকে চয়ন করে দেন। এটা মুলত সাহাবাদের কথা দ্বারা হয়েছে তাই তার নির্বাচন এদের চাওয়ার দিকে প্রত্যপিত হবে। **দ্বিতীয়তঃ এটা আহলে হাল ওয়াল আকদকে সীমাবদ্ধ করা নয় যে যারা নির্বাচন করবেন। তাদের মতকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্তব্য করা। বরং এটা বলা হয়েছে যে তাদেরকে থেকেই নির্বাচন করাহবে।** তারা প্রত্যেকেই খিলাফাহের প্রার্থী, তাদের থেকে নির্বাচন করা হবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, উসমান তাদের কয়েকজনের চয়নের মাধ্যমে ইমাম নির্বাচিত হন নি, -অর্থাৎ ছয়ের কয়েকজন- বরং মানুষের বাইয়াহ দেওয়া দ্বারা, সকল মুসলমান উসমানকে বাইয়াহ দিয়েছেন, কেউ তাকে বাইয়াহ দেওয়া থেকে পিছে হটেন নি)। এটা ইমাম আহমদও উল্লেখ করেন, অর্থাৎ উসমানের বাইয়াহ ইজমা' দ্বারা হয়েছে। এই কথার উপর প্রমাণ করে যে, হযরত আব্দুর রাহমান বিন আউফ রাজিয়াল্লাহু তিনোদিন ছিলেন, তার চোখ পুর্ণ নিদ্রা পায় নি। তিনি এদের ব্যাপারে বড় বড় সাহাবাদের পরামর্শ করেন -অর্থাৎ উসামান ও আলী- । মুসলমানদের মতকে একত্র করে, লোকদের নেতাদের মত এবং তাদের মধ্যে উত্তমদের পৃথক পৃথক ও সাধারনভাবে, দুজন দুজন, একজন একজন এবং সম্মিলিতভাবে মত নিয়ে উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু'র মতো কাউকে পান নি।

৪- আর একজনে বাইয়াহ দ্বারা দলীল যে, উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু'র আবু বকর রাজিয়াল্লাহু হাতের বাইয়াতের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন, তারপর সাহাবারা তার অনুসরণ করেছেন এবং এ বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন, এটা সঠিক নয়। কেননা তাদের অনুসরণের কারণ হচ্ছে তিনি যেটা গ্রহণ করেছেন এব্যাপারে তাদের সন্তুষ্টি, এটা এজন্য নয় যে, হযরত উমরের বাইয়াহ তাদের বাইয়াহকে আবশ্যক করেছে। আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তাকে একমাত্র উমর ছাড়া আর কেউ বাইয়াহ দেন নি, তাহলে আবু বকরের ইমামত প্রমাণিত হবে না, কেননা তিনিই তো বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া বাইয়াহ গ্রহণ করল তাহলে তার এবং যাকে বাইয়াহ দেওয়া হয়েছে তাকে অনুসরণ করা যাবে না, উভয়ের শাস্তি হচ্ছে হত্যা"।

আর বাইয়াতের ক্ষেত্রে উমরের অগ্রগামিতা এজন্য যে প্রত্যেক বাইয়াতের ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন অগ্রগামী হবে, যেমনিভাবে ইবনে তাইমিয়া বলেছেন।

৫- আর একজনের বাইয়াহ শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এই দলীল দেওয়া যে, হযরত আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, তোমার হাত বাড়াও আমি তোমার বাইয়াহ দিবো, তখন মানুষ বলবে রাসুলের চাচা তাঁর ভাতিজার হাতে বাইয়াহ দিয়েছে...

এটাও শুদ্ধ নয় কয়েকটি কারণেঃ এর মধ্যে হচ্ছেঃ

ক- এই কথাকে হযরত আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর দিকে বিশেষিত করার প্রমাণ করা আবশ্যক, এবং এটা কঠিন। কেননা বর্ণনাকারী সনদের উল্লেখ করেন নি, এমনকি উৎসও বলেন নি।আমি এর সনদের ব্যাপারে অবগত হয় নি।

খ- আর যদি এর শুদ্ধতা মেনে নেই তাহলে তো এটা পূর্ণ হয় নি এবং কার্যকর হয় নি।

গ- আর যদি এটা করে নিতেন তাহলে এটা একমাত্র মমতার প্রকাশ অন্যকে বাইয়াতের উৎসাহী করার জন্যে। আর এটা তার েই কথা প্রকাশ হয়ে যায়ঃ লোকে বলবে রাসুলের চাচা তাঁর ভাতিজার হাতে বাইয়াহ দিয়েছে, এটা হবে তার পক্ষ থেকে একটি পদক্ষেপ যাতে মানুষ তার অনুসরণ করে।

৬- আর অধিকাংশের শাফেয়ীদের যে মত একজনের রায়ের উপর খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, এটা তখন যখন আহলে হাল ওয়াল আকদ সীমিত হয়ে যাবে। যেমনিভাবে ডক্টর রাফাত উসমান

বলেছেন, কোনো যুগেই আহলে হাল ওয়াল আকদ একজনের উপর সীমাবদ্ধ হয় নি, এরকম হওয়া দুষ্প্রাপ্য। আর দুষ্প্রাপ্যের কোনো হুকুম নেই।

এর দ্বারা এইসব মতামতের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রনিধানযোগ্য কথা হচ্ছে যা হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে জান্নাতের মধ্যভাগ চায় সে যেনো জামায়াহ বা দলকে আকড়ে ধরে, কেননা শয়তান একজনের সাথে, সে দুজন থেকে দূরে। এবং হযরত উমর রাজিয়াল্লাহ বলেন, যে এমন এক ব্যক্তির হাতে বাইয়াহ দিলো মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত। তাহলে তার এবং যার হাতে বাইয়াহ দেওয়া হয়েছে তার অনুসরন করা হবে না। তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা।

তৃতীয় মতঃ এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের প্রধান্যযোগ্য মতঃ

তৃতীয় মতের গ্রহণকারীরা মধ্যপন্থা ও আহলে হাল ওয়াল আকদের সীমানা নির্ধারণ করেছেন। তারা ইজমা বলেন নি যেমনিভাবে প্রথম মতের দাবিদাররা বলেছেন, এমনিভাবে তারা সংখ্যা নির্ধারণ করেন নি যেমনিভাবে দ্বিতীয় মতের দাবিদার বলেছেন। **কিন্তু তারা শর্ত দিয়েছেন অধিকাংশ আহলে ওয়াল আকদের, যারা সংখ্যায় বেশি এবং প্রভাবশালী হবে, যাদের বাইয়াহ দেওয়া এবং যাদের নির্বাচন দ্বারা ইমামতের লক্ষ্য অর্জিত হয়।**এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই নির্বাচনের শুদ্ধতার ব্যাপারে অনেকে নিন্দা করা থেকে পিছু হটেছেন। যেমনিভাবে কম সংখ্যকের ঐক্যমত একজন খলীফাকে আধিপত্যের শরয়ী সনদ দেওয়া যায় না। কেননা কিছু সংখ্যকের পিছু হটা নেতৃত্বের লক্ষ্যে কোনো প্রভাব ফেলে না। কম সংখ্যকের ঐক্যমত বাস্তবায়নের বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। এখানে ধর্তব্য বিষয় হচ্ছে অধিকাংশের ঐক্যমত। কেননা এদের ঐক্যমত দ্বারাই খলীফার ক্ষেত্রে সাধারণের প্রতিনিধিত্ব অর্জিত হয়।

এবং মাওয়ার্দি বলেন, একদল বলেন, যে এটা প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না সব শহরের অধিকাংশ আহলে হাল ওয়াল আকদ পাওয়া যাবে। যাতে করে সবার সন্তুষ্টি পাওয়া যায় এবং তার ইমামতের জন্যে সবার ঐক্যমত পাওয়া যায়।

এই মতকে যারা গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে হচ্ছেন আবু ইয়ালা আহকামে সুলতানিয়্যাহ। তিনি বলেন, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হবে না **একমাত্র অধিকাংশ আহলে হাল ওয়াল আকদের নির্বাচন**

ব্যতীত। আহমদ বলেন, ইসহাক ইবনে ইব্রাহীমের বর্ণানুযায়ী, ইমাম হচ্ছেন তিনি যার উপর সব আহলে হাল ওয়াল আকদের কথা একত্রিত হয় যে তিনি ইমাম।

তিনি অর্থাৎ আবু ইয়ালা বলেন, একথা দ্বারা বোঝা যায় যে এটা প্রতিষ্ঠিত হবে তার জামায়াহ দ্বারা।

এমনিভাবে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাউয়্যাহে বলেন, রাফেজীদের কথার ব্যাপারেঃ তারা বলে, ইমাম হচ্ছেন রাসুল্লাহের পরেই?আবু বকর হচ্ছেন উমরের বাইয়াহ দ্বারা চার জনের সন্তুষ্টিতে, তিনি বলেন, তাকে বলা হলো, এটা আহলে সুন্নাহের ইমামগণের কথা নয়, **বরং তাদের নিকট ইমামত প্রমাণিত হয় প্রভাবশালীদের ঐক্যমতের ভিত্তিতেই, একজন পুরুষ ততুক্ষণ পর্যন্ত ইমাম হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত না এমন প্রভাবশালীরা একমত হবেন যাদের আনুগত্যের দ্বারা ইমামতের লক্ষ্য অর্জিত হবে**। তিনি বলেন, **যদি মেনে নেওয়া যায় যে, হযরত উমর ও কিছু সংখ্যক তার -আবু বকরের- হাতে বাইয়াহ দিয়েছেন এবং বাকীরা তার হাতে বাইয়াহ দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন তাহলে তিনি ইমাম হন নি,** বরং তিনি ইমাম হয়েছেন **সামর্থবান ও প্রভাবশালী অধিকাংশ সাহাবাদের বাইয়াহ দ্বারা,**

এজন্য সা'দ বিন উবাদাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু'র পিছু হটায় কোনো সমস্যা হবে না, কেননা এটা নেতৃত্বের লক্ষ্যে খুঁত সৃষ্টি করবে না, কেননা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন আধিপত্য ও সামর্থ্য অর্জন করা যার ইমামতের লক্ষ অর্জিত হবে, আর এটা অর্জিত হয়েছে অধিকাংশদের ঐক্যমত দ্বারাই, যারা বলেন, একজনের ঐক্যমত বা দু'জনের বা চার জনের ঐক্যমতে ইমাম হয়ে যাবে, অথচ এরা প্রভাবশালী এবং আধিপত্যবিস্তারকারী নন, তাহলে এটা হবে ভূল। ঠিক তদ্রূপ যারা ধারণা করেন, একজন বা দুজন অথবা দশজনের পিছু হটার দ্বারা সমস্যা হবে তারাও ভুল করেন। তিনি এমনিভাবে হযরত উসমান বিন আফফান রাজিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াতের ব্যাপারে বলেন, সমস্ত মুসলমানরা উসমানের বাইয়াতের ব্যাপারে ঐকমত ছিলো, তার বাইয়াত থেকে একজনও পিছু হটেনি... যখন প্রভাবশালী ও শক্তশালীরা বাইয়াহ দেন তখনই তিনি ইমাম হলেন, অন্যথায় যদি আব্দুর রাহমান তার হাতে বাইয়াহ দিতেন এবং আলী ও অন্যান্য প্রভাবশালী সাহাবা রাজিয়াল্লাহু আনহু বাইয়াহ দিতেন না তাহলে তিনি ইমাম হতেন না... উমর রাজিয়াল্লাহ আনহু মৃত্যুশয্যায় শায়িতাবস্থায় বলেছিলেন, একটু সময় দাও, যদি আমার কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে বনী জুদয়ানের নেতা সুহাইব তিনদিন পর্যন্ত মানুষের নামাযের ইমামতি করবে, অতঃপর তৃতীয়দিন

লোকদের মধ্যে **সম্ভ্রান্ত লোক এবং সেনাবাহিনীর নেতারা** একত্রিত হয়ে তাদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচন করবে -ছয়জন-, যে পরামর্শ ছাড়া নেতৃত্বগ্রহণ করবে তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দাও। এমনিভাবে ইবনে তাইমিয়া রাহঃ বলেন, যদি বাইয়াহ সামর্থ এবং আধিপত্যের দ্বারা অর্জিত হয় তাহলে তিনি ইমাম হবেন,**এজন্য আহলে সুন্নাহের ইমামরা বলেছেন, যার সামর্থ ও আধিপত্য হবে যার দ্বারা সে নেতৃত্বের লক্ষ্য অর্জন করতে**পারবে তাহলে সেই উলিল আমর আল্লাহ যাদের আনুগত্যের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা গোনাহের নির্দেশ দিবে, ইমামত হচ্ছে আধিপত্য ও প্রভাব, আধিপত্য একজন বা দুজন বা চারজনের ঐক্যমতে হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের ঐক্যমত হবে যাদের ঐক্যমত অন্যদের ঐক্যমতের ব্যাপারে নিয়ে যায়...

জুয়াইনি বলেন, প্রয়োজনের স্বার্থে অবশ্যই ইমামকে পদচ্যুত করতে হবে, এবং প্রভাবের ভিত্তিতে ইমাম নির্ধারণ করতে হবে। সাবী বলেন, এ ব্যাপারে ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যার দিকে আবু ইয়া'লা, ইবনে তাইমিয়া এবং যারা এ দুজনের অনুসরন করেছেন, যে এটা প্রতিষ্ঠিত হবে অধিকাংশ আহলে হাল ওয়াল আকদের দ্বারা যাদের বাইয়াত দ্বারা ইমাম নির্ধারণের উপর অধিকাংশ মুসলমানদের সন্তুষ্টি প্রমাণ করে, তারা হবেন নিজেদের সময়ের প্রভাবশালী ও আধিপত্যবিস্তারকারী যাদের বাইয়াহ ছাড়া ইমামত পূর্ণ হয় না। এটা অস্পষ্ট নয় যে, সবার মত নেওয়া কষ্টকর এবং একজনের উপর নির্ভর করা বেশি শিথিলতা।

এ হিসেবে ইমাম এবং খলীফা শরয়ী' বাইয়াতের জন্যে দু বিষয় পরিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক, এগুলো হচ্ছেঃ

১- অধিকাংশ আহলে হাল ওয়াল আকদের বাইয়াহ হওয়া আবশ্যক যাদের বাইয়াতের উপর অধিকাংশ মুসলমানদের সন্তুষ্টি নিদর্শন করে যেমনিভাবে বুখারী শরীফে এসেছে যে, হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ...যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া বাইয়াহ গ্রহণ করলো তাহলে তার এবং যে তাকে বাইয়াহ দিলো অনুসরণ করা যাবে না, তাদের শাস্তি হচ্ছে হত্যা। এবং শূরার ছয় সদস্যদের ব্যাপারে তার কথা যে, তোমাদের মধ্য থেকে মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া নেতৃত্ব গ্রহণ করবে তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দাও। সহীহ সনদে ইবনে সা'দ তা বর্ণনা করেন, এমনিভাবে ইবনে হাজরও ফাতহের দুটি স্থানে তা বর্ণনা করেন। মা'রূর ইবনে সুওয়াইদ

উমর থেকে এমনিভাবে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যে মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া কোনো নেতৃত্বের দিকে আহবান করে তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দাও।

২- তারা হবেন প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ইমামতের লক্ষ্য যাদের ব্যতীত পূর্ণ হবে না।

এই উপস্থাপনের পর আমরা বলি, যদি আমরা এই ঘোষণার উপর একটু চিন্তা করি, যা আমরা পুর্বে বিস্তারিত উপস্থাপন করেছি এর হিসেবে তাহলে আমরা পাই এখানে ইমামত প্রতিষ্ঠার দুনো কারণই লুপ্ত হয়েছেঃ

এদিকে তারা -অর্থাৎ খিলাফাহ ঘোষণাকারীরা- উম্মতের অধিকাংশ আহলে হাল ওয়াল আকদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নি, বরং তারা নিজেদের ছাড়া জিহাদের উমারা আহলে হাল ওয়াল আকদের পরামর্শ গ্রহণ করে নি যারা আহলে হাল ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকতর উপযুক্ত। চাহে তারা খোরাসানে হোক, বা পাকিস্তানে, বা ইয়েমেনে, বা সোমালিয়াতে, বা আলজেরিয়ায়,বা ককেশাশে, বা মালিতে, বা তিউনিশিয়াতে, বা সিনাইয়ে, বা ফিলিস্তিনে বা অন্যান্য মুজাহিদরা তারপর না তারা এই উম্মতের অধিকাংশ আহলে হাল ওয়াল আকদের পরামর্শ গ্রহণ করবে। জেনে রাখা উচিৎ আমরা যখন উম্মতের আহলে হাল ওয়াল আকদের কথা বলি তখন এর দ্বারা তাগুতের উলামা বা পশ্চিমাদের চামচা ও তাদের বিভিন্ন ধরনের চাকরদের কথা উদ্দেশ্য নেই না, না নিজের রিপুর অনুসারীদের। বরং আমরা এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেই ওইসব ব্যক্তিদের যাদের মধ্যে আহলে হাল ওয়াল আকদের ওইসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যার কথা সহীহ আকীদার অনুসারী আহলে ইলম, সত্য, ন্যায়, প্রজ্ঞা, প্রভাব অধিকারীরা উল্লেখ করেছেন, আমরা মনে করি মুসলমানদের এমন কোনো ভূমি আল্লাহর প্রশংসায় বিশেষকরে জিহাদের প্রাঙ্গণসমুহ যেগুলো আমরা পুর্বে উল্লেখ করেছি শূন্য নয়। সেখানে অনেকউমারা, উলামা, মাশায়েখ এবং আকীদার, ইলম, বিজ্ঞমত ও প্রভাবের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। যাদের মধ্যে অনেকে প্রসিদ্ধ আছেন, আবার অনেকে এর বিপরীত, তাদের অখ্যাতি তাদের অধিকার হ্রাস করবে না। তাদের রয়েছে জিহাদ ও উম্মতের প্রতিরক্ষায় দশকের পর দশকের কার্যক্রম। আল্লাহ তাঁদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম বদলা দিন। তারা হচ্ছেন যেভাবে আমরা পুর্বে উল্লেখ করেছি আহলে হাল ওয়াল আকদে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিক উপযুক্ত। আমার ধারণা এ ব্যাপারে কোনো নীতিবান বুদ্ধিমান সন্দেহ করবে না।

অন্যদিকে তারা -অর্থাৎ খিলাফাহ ঘোষণাকারীদের- নিকট এমন ক্ষমতা ও প্রভাব নেই যার দ্বারা উম্মতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পরিপূর্ণ হবে, এর দ্বারা নত হবে তারা যারা তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা ইরাক ও শামের বাহিরে হবে, এর দ্বারা খিলাফাহের লক্ষ্য অর্জিত হবেএমনকি অবস্থাটা সুস্পষ্ট পরিষ্কার হবে। আমরা বলি দাওলার শাসন তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাসমুহ ইরাক ও শামে, এটা হচ্ছে আফগানিস্তানে তালেবানের শাসনের মতো, চাহে তা আফগানিস্তানের যুদ্ধের পূর্বে হোক বা এখন। তালেবান তখন একটি রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা করার সব ধরনের সামর্থ্য অর্জন করেছিলো, যেমন তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় মন্ত্রাণালয় ও সেবাসংস্থা ছিলো, এবং তাদের নিজস্ব মুদ্রা ছিলো ইত্যাদি। জেনে রাখা উচিৎ এখনো তারা আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে, এমনিভাবে তেহরীকে তালেবান পাকিস্তানও ওয়াজিরিস্তানে কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে এমনকি তারা ২০০৮সালের এক পর্যায়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে পৌছে গিয়েছিলো, এমনিভাবে হরকাতে শাবাবের অবস্থা সোমালিয়ায় এবং এমনিভাবে ইয়েমেনের আদন ও শাবওয়াহে আন্সারুশ শরীয়াহের নিয়ন্ত্রণ, এমনিভাবে মালিতে আনসার-আদ-দ্বীনের অবস্থা ছিলো যখন তারা আধিপত্য অর্জন করেছিলো, সুতরাং এদের মধ্য থেকে কারোরই একক অধিকার নেই অন্যান্য মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত খিলাফাহের ঘোষণা দেওয়া, কেননা এসব ঘোষণা দ্বারা দুই বিষয়ের অনুপস্থিতি পাওয়া যায়, প্রথমঃ ইমামত মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত প্রতিষ্ঠা হওয়া, দ্বিতীয়তঃ তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা ব্যতীত অন্য কোথাও তাদের প্রভাব নেই, এটা তখন যখন আমরা মেনে নিব যে একটি রাষ্ট্রের সবধরনের প্রতিরক্ষা এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং অন্য এলাকায় তাদের প্রভাব নেই।

এখানে আমরা আরেকটু ভাবার জন্যে ফিরে যাই ওইসব প্রশ্নের উত্তরের জন্যে যেগুলো আমরা প্রথমে উত্থাপন করেছিলাম যাতে চিত্রটা আরো সুস্পষ্ট হয়ঃ

আমরা বলি, এর উত্তর আমরা ওইসব পন্থায় পাবো না, যেগুলোর কথা আহলে সুন্নাহের ইমামরা বর্ণনা করেছেন, আর সেগুলো হচ্ছে ইখতিয়ার(নির্বাচন), বা স্থলাভিষিক্ত করা অথবা শরীয়াহ বহির্ভুত পন্থা, কিন্তু এটা না জায়েয হওয়া সত্ত্বেও জরুরতের সময় মেনে নেওয়া যায়, আর এটা হচ্ছে আগ্রাসন বা আধিপত্য।

যদি বলা হয় যে, খিলাফাহ তো ইখতিয়ার(নির্বাচনের) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তাহলে আমরা বলবো, এ কথা সঠিক নয় আমাদের পুর্বের আলোচনা অনুযায়ী, এমনকি দাওলাহ নিজেও

বলেছে যে, তারা কারো সাথে পরামর্শ গ্রহণ করে নি, বরং যারা এই খলীফাকে নির্বাচন করেছেন তারা হচ্ছেন মূলত এই দাওলারই শায়খ আবু বকর বাগদাদিই যে মজলিশে শূরার মধ্য থেকে, আর তারাই খলীফা নির্ধারণ করলেন!

যদি বলা হয় যে, এটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শায়খ আবু উমর রাহিমাহুল্লাহের স্থলাভিষিক্ত করার মধ্য দিয়ে, তাহলে আমরা বলবো যে, দাওলাহ নিজেও দাবি করে নাই যে, আবু উমর রাহিমাহুল্লাহ খলীফা ছিলেন না, যে তিনি আবার অন্যকে স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করবেন, যদি ধরে নেওয়া যায় যে তারা এটাই দাবি করে -তাহলে এটাও সেভাবে অর্জিত হয় নি যেভাবে আমরা বলেছি- তাদের দাবির ব্যাপারে আমরা অবশ্যই আলোচনা করতাম আমরা এই ঘোষণার ব্যাপারে আলোচনা করছি, অতএব ভেবে দেখুন, যদি মেনে নেওয়া যায় তিনি মুলত খলীফা -অর্থাৎ আবু উমর- এবং তিনি স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেছেন, তাহলে ইস্তেফলাফ (স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণে)র শর্ত হচ্ছে এর উপর আহলে হাল ওয়াল আকদ একমত হবেন, যেমনিভাবে হযরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু সাহাবাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন যখন উমরকে তার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেছেন, বরং তারা হচ্ছেন যারা প্রথমেই তার কাছ থেকে স্থলাভিষিক্তির আহবান জানিয়েছেন, এজন্য ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, এমনিভাবে উমরের কাছে যখন আবু বকর দায়িত্ব অর্পন করেছেন তখন তিনি ইমাম হন নি বরং যখন তারা তার হাতে বাইয়াহ দিয়েছেন এবং তার আনুগত্য করেছেন তখন তিনি ইমাম হয়েছেন। যদি তারা আবু বকরের কথা বাস্তবায়ন করতেন না এবং তাকে বাইয়াহ দিতেন না তাহলে তিনি ইমাম হতেন না।

সুতরাং ভাবুন!

মূলতঃ আবু উমর -আল্লাহ তাকে কবুল করুন- হচ্ছেন একজন আমীর যিনি তখন ইরাকের অনেক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, যেমনিভাবে আবু যুবাইর সোমালিয়ায়, মোল্লা উমর আফগানিস্তানে এবং অন্যান্যরা অন্যসব এলাকায়- এখানে একটি ব্যাপারে সতর্ক করা প্রয়োজন যে, জিহাদের শায়খরা যেমন শায়খ উসামা ও শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি শায়খ আবু উমর রাহিমাহুল্লাহ-কে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে এটা কারণে যে তিনি ইরাকের আমীর, না তিনি খলীফা, একজন চিন্তাশীল মানুষ তা সহজেই বুঝতে পারবে। আর তাকে যে আমীরুল মুমিনীন বলা হত এর দ্বারা মুসলমানদের খিলাফাহ উদ্দেশ্য নেওয়া হয় নি, তিনি এক্ষেত্রে মোল্লা উমর হাফিজাহুল্লাহের মতো ছিলেন, তাকেও আমীরুল মুমিনীন খেতাবে সম্বোধন করা হত। অথচ

তিনি তো খলীফা ছিলেন না, তিনি এটাও দাবিও করতেন না। এটা হচ্ছে এমন উপাধি যার দ্বারা উভয়েই সম্বোধিত হয়েছেন। মুল সর্বদা বাস্তবতা এবং অর্থ দিয়ে হয়, নামগ্রহণ এবং শব্দপ্রয়োগ দ্বারা নয়।

যদি বলা হয় যে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় গায়রে শরয়ী পন্থায়, আর এটা হচ্ছে জোরপূর্বক প্রভাব বিস্তার ও আধিপত্য দ্বারা, তাহলে বলা হবে অর্জিত হয় নি এবং এটা শুদ্ধ নয়। যেমনিভাবে আমরা পুর্বে বলেছি। প্রত্যেক বুদ্ধিমান এটা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে জানে যে তাদের আধিপত্য খোরাসানে নয়, সোমালিয়াতেও নয়, এ দুটো ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম ভূমিতে নয়। তেমনিভাবে ওইসব দেশেরও আধিপত্য ও প্রভাব যে, ইরাক ও শামে দাওলা নিয়ন্ত্রিত এলাকাসমূহে নয় যে তাদের আধিপত্য অর্জিত হবে। - একথা জেনে রাখা উচিৎ যে, আমরা এগুলো উল্লেখ করছি শরয়ী দৃষ্টিতে মাসয়ালাকে স্পষ্ট করার জন্যে, অন্যথায় আমরা এদের প্রত্যেককেই সম্মান করি, যে তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আমরা মনে, আল্লাহ ভালো জানেন দ্বীনকে সাহায্য করা, ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভূল করছেন। যাইহোক এখানে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেলো যে, তাঁদের আধিপত্য ও প্রভাব একজন সমস্ত মুসলমানদের খলীফাদের মতো নয়।

এমনিভাবে আমরা এখানে জিজ্ঞেস করতে চাই, যে, ঘোষিত খলীফার কি এমন ক্ষমতা আছে যে তিনি যেসব মুসলমান বন্দি নারী-পুরুষের জন্যে নিজেকে খলীফা বানিয়েছেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে তাদেরকে মুক্তির জন্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন। চাহে তা মুরতাদদের কবল থেকে হোক, অথবা কাফিরদের কবল থেকে যেমন চীন, রাশিয়া, আমেরিকা ইত্যাদির কবল থেকে, তাঁর কি এমন সামর্থ আছে যে তিনি ফিলিস্তিনের ওই বৃদ্ধের সাহায্য করবেন যার ঘর ধ্বংস করা হয়েছে, অথবা মৌরিতানিয়ার কোনো মুসলমানের হৃত মাল উদ্ধার করে দিবেন, তারপরও না বলবো যে তিনি কি পারবেন ওইসব এলাকায় অবস্থিত সমস্ত মুসলমানদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, নিরাপত্তা, খাবার এবং তাদের রাস্তা সুগম করে দিতে পারবেন, যেমনিভাবে হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় থাকাবস্থায় বলেছিলেন, “আল্লাহর কসম, যদি ইরাকের ঘনবসতি এলাকায় কোনো খচ্চরও হোচট খায় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি এর ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হবো, কেনো আমি তার জন্যে রাস্তা সুগম করে দিলাম না!?”

উপসংহারে... আল্লাহ তায়ালা যেনো তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সমস্ত মুসলমানকে কালিমায়ে তাওহীদের উপর এক করে দেন, এবং মুজাহিদদেরকে নিজেদের মনের কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত করুন। এবং মুসলিম উম্মাহের জন্যে এমন খিলাফতে রাশেদা ফিরিয়ে দেন যা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে নববী দ্বারা পরিচালিত হবে...

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন,

লিখেছেন- মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-মুহাজির